দুই মেরুর হয় নাকো দেখা

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

ফারুক তার বড় ভাই ফয়সালের পেছনে শুধু হাঁটছে আর হাঁটছে। আচ্ছা, ভাইয়া তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? চিন্তা করে কূল পেল না ফারুক। আবার বড় ভাইকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছে না। চুপচাপ চলতে থাকল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় তারা মাটির রাস্তা পেরিয়ে মহাজনবাড়ির সামনের পাকা রাস্তায় এসে উঠল। দুইতলা পাকা মস্ত বাড়ি। বাড়ির সামনে বাঁশ আর ঝালর দেওয়া কাপড় দিয়ে সাজানো জমকালো বিয়ের গেট। গেট থেকে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত নানান রঙের মরিচবাতি আর ঝাড়বাতির বহর।

আগামী সপ্তাহে মহাজনের ছেলের বিয়ে। কত সাজ, কত আয়োজন এই বিয়েকে ঘিরে! ফারুক হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির পাশের মাঠটায় বিশাল এক প্যান্ডেল। এ যেন রাজ-রাজরার বিয়ে! হুলুস্থুল ব্যাপার-স্যাপার! প্যান্ডেলের ভেতর উঁচু করে সিঁড়ি দেওয়া লাল মখমলের মঞ্চ। তাতে রাজা-রানির আসনের মতো দুটো চেয়ার। ঢাকা থেকে একদল লোক এসেছে বিয়ের মঞ্চ সাজাতে।

মহাজনবাড়ি পেরিয়ে ওরা দুই ভাই মেইনরোডে এসে দাঁড়াল।

ফারুক ভয়ে ভয়ে ফয়সালকে জিজ্ঞেস করল–'ভাইয়া! আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

ফয়সাল নির্লিপ্ত গলায় বলল–'স্টেশনে।'

'স্টেশনে? ট্রেন দেখতে যাব?'

'না, একটা কাজে যাচ্ছি। স্টেশনের পত্রিকার দোকানে যাব।'

ফারুক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে–'তুমি আবার পেপার বিক্রি করবে ভাইয়া? তোমার না সামনে পরীক্ষা?'

ফয়সাল ঠোঁট কামড়ে আমতা আমতা করে বলল–‘আসলে হয়েছে কী, এই কাজটা আমি তোকে করতে বলছি। তুই তো বড় হয়ে গেছিস, তাই না? ক্লাস সিক্সে উঠেছিস। হাইস্কুলে পড়িস। কত দূর থেকে শহরে পড়তে যাস। পথ-ঘাট সব চিনে ফেলেছিস। আব্বার অবস্থা তো জানিসই। সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। তুই পারবি না আমার কাজটা করতে? কটা দিন কর না ভাই আমার। আমার পরীক্ষা শেষ হলেই তুই বাদ দিয়ে দিস।’

ফারুক মুহূর্তেই চুপ হয়ে গেল।

দুই ভাই হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। মাঝে মাঝে একটা-দুইটা অটো যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই একটা অটো ওদের সামনে এসে থামল।

তাদের নিয়ে অটো ছুটতে থাকে। দুই পাশের মাঠ-ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছে। শীতের দমকা বাতাস এসে নাকে-মুখে লাগল। সাথে সাথেই ফারুকের বুকের ভেতরের হাড়গুলো যেন কনকন করে উঠল। গলার মাফলারটা ভালো করে কানে পেঁচিয়ে নিল সে। একটু পরেই অটোটা শহরের ভেতরে ঢুকতেই ঠান্ডা লাগাটা একটু কমে এলো।

ওরা স্টেশনের সামনে এসে নামল। এটাই গাইবান্ধা জেলাশহরের ছোট্ট রেলস্টেশন।

বাঁশ বাগানে ভূ.........ত

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

এক

সামনে ওটা কি! কী ভয়ংকর! হঠাৎ বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা ঝড়ো বাতাস বয়ে গেল। পাতায় পাতায় তুলল শনশন শব্দ। অনেকক্ষণ হলো দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্যটাও পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আঁধারে ঢেকে গেছে ঘন বাঁশঝাড়ের ভেতরটা। একটা নাম না জানা পাখি কিছুক্ষণ পরপর অদ্ভুতভাবে ডেকে উঠছে। মাটিতে শুকনা পাতার স্তূপ। স্তূপের নিচ দিয়ে সরসর করে কী যেন ছুটে গেল। গা ছমছম করা পরিবেশ।

হঠাৎ একটা বাঁশ শামিমের সামনে এসে নুয়ে পড়ল। সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। ঠিক তখনই ওর চোখে পড়ল সাদা থান কাপড় পরা পেতনিটাকে। সাদা শনের মতো চুল দুইপাশে ছড়িয়ে আছে। তোবড়ানো গালে হাজার বছরের ছাপ। অক্ষিকোটরের ভেতরে আগুনের ভাটার মতো দুইটা চোখ জ্বলজ্বল করছে। লম্বা, হাড় জিরজিরে হাতটা তুলে পেতনিটা ইশারায় ডাকছে শামিমকে। শামিমের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামল। হিম হয়ে গেল তার পুরো শরীর।

বাঁশঝাড়ের পুবে গোরস্থান। সেখান থেকে একটা দমকা বাতাস মরা-পচা গন্ধসমেত নাকে এসে ধাক্কা দিল। নুয়ে থাকা বাঁশটা অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকল। সাদা থান কাপড় পরা পেতনিটা এগিয়ে আসছে শামীমের দিকে। এটা দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

গোরস্থান আর বাঁশঝাড়ের এদিকটায় কোনো ঘরবাড়ি নেই। এ পথে তেমন কোনো মানুষ যাতায়াত করে না। তাই এখানে চিৎকার দিয়েও কোনো লাভ নেই। কেউ আসবে না। তবুও সাহস করে শামিম চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না।

শামিম ভাবল, যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। পেতনিটা মচমচ শব্দ তুলে তার দিকে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। শামিমের হাতে স্কুলব্যাগ। ব্যাগটা এক গাদা গল্পের বই দিয়ে ভর্তি। সে ব্যাগটা ফেলে দিল ভোঁ দৌড়। দৌ...ড়...দৌ...ড়, প্রাণপণে ছুটতে লাগল। শামিমের মনে হচ্ছে–কিছু একটা ওকে দৌড়াতে বাধা দিচ্ছে। ওর পেছন পেছন কিচকিচ শব্দ তুলে ছোট ছোট ভূতেরা আসছে... সে জানে, আয়াতুল কুরসি পড়লে দুষ্ট জিনেরা কাছে আসার সাহস পায় না। ও আয়াতুল কুরসি পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে–কে যেন গলা চেপে ধরেছে... কণ্ঠনালি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোনো শব্দই বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। কোনো মতে 'আল্লাহ আল্লাহ' জপতে জপতে দৌড়াতে লাগল।

নুর হোসেনের আলোর ম্যাজিক

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

সকাল থেকেই শামিমের বুকটা ঢিপঢিপ করছে। আজকে ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে। পাস করলে ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠবে। সব সাবজেক্টে ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে। শুধু গণিতটা জঘন্য রকমের খারাপ হয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে সবার সাথে যখন উত্তর মেলাচ্ছিল, তখন জানতে পারল—সরল অঙ্কটার উত্তর Y_2 হবে, আর ওর উত্তর Y এসেছে। ঐকিক নিয়মের অঙ্কটার উত্তর নাকি ৮০ হবে, কিন্তু ওর উত্তর ৮ এসেছে। একটু-আধটু ভুল হয়েছে—তাতে কী? গণিত শিক্ষক রঘু স্যার তা কিছুতেই মানবেন না। ঘ্যাঁচ করে কেটে দিয়ে দুইটা আস্ত আন্ডা বসিয়ে দেবেন।

রঘু স্যার ভয়ানক রাগী মানুষ। একটা ভারী চশমা সব সময় নাকে এঁটে থাকে। আর মাথায় সব সময় ঘোরে অঙ্ক।

একদিন বাবার সাথে বাজার করতে গেলে শাকের দোকানে স্যারের সাথে দেখা।

তিনি চিনতে পেরেই খপ করে ধরে ফেলে বললেন—'তুই ক্লাস সিক্সের শামিম না?'

শামিম কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'জি স্যার।'

'বাজারে কী?'

'আব্বুর সাথে এসেছি স্যার। লালশাক কিনব।'

স্যার শাকওয়ালাকে প্রশ্ন করলেন—'ওহে শাকওয়ালা! তোমার শাকের দাম কত?'

শাকওয়ালা বলল–‘প্রতি আঁটি দশ টাকা।’

রঘু স্যার নাকে ঝোলানো চশমার ফাঁক দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন–‘তা কিনেছিলে কত দিয়ে?’

‘আট টাকা করে। আপনে কিনবেন? কয় আঁটি দিমু?’

‘না, কিনব না। একটা অঙ্ক করব, তাই দাম শুনলাম।’

তারপর তিনি শামিমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন–‘ওহে শামিম! এবার বল তো দেখি, লালশাকের আঁটির ক্রয়মূল্য ৮ টাকা আর বিক্রয়মূল্য ১০ টাকা হলে শাকওয়ালার শতকরা লাভ কত?’

শামিম শতকরার অঙ্ক শুনেই ঢোক গিলেছিল। অনেকক্ষণ ভেবে মাথা নিচু করে বলেছিল–‘খাতা-কলম ছাড়া পারব না, স্যার।’

তারপর সেই বাজারভর্তি মানুষের মধ্যে বাবা আর রঘু স্যার মিলে ওকে আচ্ছা করে বকেছিল। শাকওয়ালাটা মজা পেয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছিল।

রঘু স্যার গণিতকে মজার সাবজেক্ট বলেন; অথচ গণিতের মতো খিটমিটে সাবজেক্ট আর একটাও নেই। সরল অঙ্ক শুধু নামেই সরল। আসলে এত প্যাঁচ যে, এর নাম হওয়া উচিত ছিল গরল। চৌবাচ্চা ফুটো করে দুই-তিনটা নল দিয়ে কে পানি ভরায় আর কেই-বা পানি ভর্তি করার সময়ের এত বিদঘুটে অঙ্ক কষে? কে বাঁশে তেল মেখে বানরকে উঠায় আর নামায়? তারপর সেই তৈলাক্ত বাঁশে উঠার সময় হিসাব কষে? নৌকা স্রোতের অনুকূলেই যাক আর প্রতিকূলেই যাক–তাতে মাঝির কীই-বা আসে-যায়? নৌকার বেগ বের করারই-বা দরকারটা কী? অঙ্ক কষতে গেলে এই সব প্রশ্নই শুধু মাথায় ঘুরতে থাকে।

শামিম ধীর পায়ে স্কুলের রেজাল্ট বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর বন্ধু উমার, রাজু, আনাস, ফারুক, মুয়াজ, সিয়াম, মাহমুদ সবাই আগেই এসে পড়েছে। সিয়াম বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে, সেকেন্ড হয়েছে। খুশি হয়ে সবাইকে জানাচ্ছে, রোল দশ থেকে এক লাফে দুই! ফারুক আর উমারও খুশি। সেরা দশের মধ্যে আছে। আনাস সেরা দশে না থাকলেও পনেরোর মধ্যে আছে।

রেজাল্ট পজিশন অনুসারে সাজানো হয়েছে। শামিম ওপরের দিকে আর তাকাল না। চল্লিশ পজিশন থেকে খুঁজতে লাগল। সত্তর পর্যন্ত সিরিয়ালে ওর নাম নেই। পাশে আলাদা একটা শিট দেওয়া হয়েছে। সেখানে অকৃতকার্য ছাত্রদের নাম ঝোলানো হয়েছে।

শামিমের হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করছে। সে দেখল, অকৃতকার্য ছাত্রদের নামের তালিকায় প্রথম নামটি শামিম পাটোয়ারি।

শফিক স্যার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন–'গুড, ভেরি গুড। এবার তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলো তো, কখন অমাবস্যা হয়?'

ফারুক হেসে বলল–'স্যার, এটা তো খুব সোজা। চাঁদ আবর্তন করতে করতে যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পরে, তখন চাঁদের যে পিঠ আলোকিত, তা আর দেখা যায় না। চাঁদের অন্ধকার পিঠটাই আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই। আর একেই অমাবস্যা বলে।'

শফিক স্যার জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন–'গুড, ভেরি গুড, মাই বয়েজ।'

শফিক স্যার বাংলা স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন–'এবার বুঝলেন তো, এই চাঁদের আবর্তনের সাথে কত কিছুর পরিবর্তন হয়। সবকিছুই সাইন্টিফিক ব্যাপার-স্যাপার? সাহিত্য তো সাইন্টিফিক নয়। এই যে ধরেন, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল, তিনি তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে লিখেছেন– 'দেব খোপায় তারার ফুল।' এটা কী করে সম্ভব? যদি বিশাল ভারের তারা খোপায় গুঁজে দেওয়া হয়, তাহলে তো সেই ভারে প্রিয়া মরেই যাবে!'

চলো, সমুদ্রে যাই

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক

চিঠিটা পড়েই আনাসের মুখ খুশিতে ভরে গেল। আবার পরক্ষণই একটা দুশ্চিন্তা এসে ভর করল। বাবা-মা কি রাজি হবেন? আনাস চিঠিটা হাতে নিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বড় ভাই নকিবকে বলল—‘ভাইয়া, মা কি আমাকে যেতে দেবেন?’

নকিব একটু ভেবে বলল—‘মনে হয় না অত দূর মা তোকে একা ছাড়বেন।’

আনাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—‘কেন যে আমার ইচ্ছেগুলো পূরণ হয় না! সব সময় অধরা থেকে যায়!’

‘যখন বড় হবি, তখন সব ইচ্ছে পূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ। এটা নিয়ে এত মন খারাপ করিস না তো।’

মা ঘরে ঢুকেই বললেন—‘শাহেদ নাকি চিঠি পাঠিয়েছে, কী লিখেছে দেখি। ওর না এখানে আসার কথা?’

আনাস চিঠিগুলো মাকে দিল। মা চিঠি পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন—‘আলহামদুলিল্লাহ!’ শাহেদ পিএইচডি করতে বিদেশে যাবে! স্কলারশিপ পেয়েছে! কী ভালো খবর!’

আনাস ঠোঁট উলটে বলল—‘তুমি শুধু অতটুকুই পড়লে, মা। নিচের প্যারাটুকু পড়োনি?’

মায়ের হাসিমুখটা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। কঠিন স্বরে বললেন—‘শাহেদ বিদেশ যাওয়ার আগে দেশ ঘুরে দেখতে চায়, দেখুক। খুব ভালো কথা।’